আচার বা প্রথা **(Custom)**

‘আচার’ বা ‘প্রথা’ যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Custom ও ‘অনুষ্ঠান’ শব্দ দুটিকে আমরা সাধারণতঃ একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যেমন বিবাহ আমরা একটি সামাজিক আচার বা প্রথা বলি, আবার কেউ কেউ আমরা অনুষ্ঠানও বলি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনে শব্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, ‘সমাজসম্মতভাবে পান-ভোজন করা, আলাপ-আলোচনা করা, আত্মীয়-পরিজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, প্রেমালাভ করা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, বয়স্কদের যত্ন করা ইত্যাদি অজস্র বিষয় হল আচার বা প্রথা। আচার বা প্রথা হল সমাজ অনুমোদিত পথে কর্ম করা’।

জিসবার্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘সমাজ অনুমোদিত অভ্যস্ত ক্রিয়াই হচ্ছে আচার বা প্রথা। যেমন বাসের স্ট্যান্ডে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো, পরিচিত ব্যক্তির সাথে দেখা হলে করমর্দন করা বা দুই হাত জোড় করে নমস্কার করা অথবা কুশল বিনিময় করা ইত্যাদি হচ্ছে আচার বা প্রথা। সমাজে বসবাস করে এ সব প্রথাকে মান্য করতে হয়, অমান্য করলে, অমান্যকারী নিন্দাভাজন হয়। আবার কখনো কখনো সমাজ কর্তৃক তিরস্কৃতও হয়।

জিসবার্ট আচার বা প্রথার তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলি হল যথাক্রমে ১) প্রতিক্ষেত্রে একইভাবে আচরণ(অভ্যস্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যা হয়), ২) সামাজিকতা এবং ৩) আদর্শগত মূল্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য আচারকে অভ্যস্তক্রিয়া থেকে ভিন্ন করা যায়। অভ্যস্তক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি একইভাবে হলেও তার কোন সামাজিক বা আদর্শগত মূল্য নেই। অভ্যাস একান্তভাবে ব্যক্তিগত, যার সামাজিক অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। যেমন মধ্যাহ্ন ভোজের পর একটি পান খাওয়া নেহাৎই ব্যক্তিগত ব্যাপার অর্থাৎ অভ্যাস, যেখানে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকে না, সমাজের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

আর এখানেই অভ্যাসের সাথে আচার বা প্রথার পার্থক্য। প্রথা সামাজিক এবং সেজন্য কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal)। প্রথা হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি, সমাজে বসবাস করতে গেলে মানুষকে যাদের পালন করতে হয়। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর কোন ব্যক্তির পান খাওয়া একটি অভ্যাস, সে যদি কোন একদিন তা না খায় তাহলে তাকে সমাজের কাছে নিন্দাভাজন হতে হয় না। কিন্তু জনবহুল শহরে প্রথা লঙ্ঘন করে কেউ যদি লাইনে না দাঁড়িয়ে বাসে উঠতে চায় তাহলে অপরে তার নিন্দা করে, এমনকি তিরস্কারও করে। আচার বা প্রথার মতো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও একপ্রকার সামাজিক রীতিনীতি। এদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই আছে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য।

প্রথা ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপে আলোচনা করা যেতে পারে -

১) প্রথার প্রকাশ ঘটে অপেক্ষাকৃত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সংঘ-সমিতির অনুষ্ঠানগুলিকে মানুষ অনুসরণ করলেও তাদের 'প্রয়োজনীয়' জ্ঞানে অনুসরণ করে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে না। সামাজিক প্রথাগুলিকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করে। অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা বাধ্যবাধকতা-ভাব থাকে - সংঘ-সমিতির কাছে। মহাবিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী (অনুষ্ঠান) ছাত্র-ছাত্রীরা অনুসরণ করলেও তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে না; কিন্তু বন্ধু-বান্ধবী বাড়িতে এলে তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপ্যায়ন (প্রথা) করে। অর্থাৎ প্রথা বা আচারের ক্ষেত্রে মানুষের যোগ যতটা গভীর অনুষ্ঠানের সাথে ততটা গভীর নয়।

২) প্রথা অপেক্ষা অনুষ্ঠান অনেক বেশী ব্যাপক ও সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক সমাজে প্রথার স্বীকৃতি অপেক্ষা অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি অনেকবেশী ব্যাপক ও বিস্তৃত। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথা বা আচার-ভেদ লক্ষ্য করা গেলেও অনুষ্ঠনগুলি মোটামুটি একই রকম থাকে। যেমন - বিবাহরূপ অনুষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পালন করা হলেও আনুষ্ঠানিক প্রথাগুলি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৩) সমাজে প্রথা অপেক্ষা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। বিষয়টিকে আমরা একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজে বুঝে নিতে পারি। পরিবার হচ্ছে সংঘ-সমিতি, বিবাহ তার অনুষ্ঠান এবং বিবাহ-পূর্ব নরনারীর ঘনিষ্টতা বা courtship (বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে) একটি প্রথা। পরিবারের কাছে বিবাহরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিবাহ-পূর্ব ঘনিষ্টতা বা Courtship অপেক্ষা অনেক বেশী। নর-নারীর মধ্যে বিবাহ-পূর্ব ঘনিষ্টতা, পরিবারের কাছে আবশ্যিক নয়, কিন্তু বিবাহরূপ অনুষ্ঠানটি আবশ্যিক। বিবাহের মাধ্যমেই নর-নারী তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে।

৪) সমাজজীবনে অনুষ্ঠানের মূল্য আচার বা প্রথা অপেক্ষা অনেক বেশী। আচার বা প্রথা লঙ্ঘন করলে গোষ্ঠীজীবনে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও সমাজের সংহতি ও স্থায়িত্ব অক্ষুন্ন থাকে; কিন্তু অনুষ্ঠান অমান্য করলে সমাজজীবনের সংহতি বিনষ্ট হয়। কাজেই সমাজের সংহতি ও স্থায়িত্বের পক্ষে অনুষ্ঠানের ভূমিকা প্রথার ভূমিকা অপেক্ষা অনেক বেশী।

৫) প্রথার তুলনায় অনুষ্ঠান অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক। প্রথার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি মিলিত হয়ে সমাজসম্মতভাবে কর্ম করে। কাজেই প্রথা সামাজিক হলেও সেক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির এক নিবিড় সম্পর্ক থাকে। অনুষ্ঠানের পরিধি অনেক বেশী বিস্তৃত হওয়ায় সেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের যোগসূত্র তেমন থাকে না, সমাজের নির্দেশই প্রাধান্য পায়। আর এজন্য প্রথা অপেক্ষা অনুষ্ঠান অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক।

৬) প্রথা ও অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত হলেও, ব্যক্তির জীবনে অনুষ্ঠানের প্রভাব প্রথা অপেক্ষা বেশী। প্রথা অমান্য করা সহজ, কিন্তু অনুষ্ঠান অমান্য করা অত সহজ নয়। প্রথা না পালন করলে সমাজ কেবল নিন্দাই করে, প্রথা বা আচার পালনে ব্যক্তিকে বাধ্য করা যায় না। অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমাজের চাপ বা শাসন অপাক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশী। অনুষ্ঠান পালন না করলে সমাজ ব্যক্তিকে তিরস্কার করে, কখনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে, কখনো আবার সমাজচ্যুতও করে। সমাজে এপ্রকার শাস্তির ভয়ে মানুষ সাধারণত অনুষ্ঠানগুলিকে অনুসরণ করে চলে।

‘পরিবার’ নামক সংঘ-সমিতির ‘বিবাহ’ হচ্ছে অনুষ্ঠান, আর বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রণ ও তাদের আপ্যায়ন হচ্ছে প্রথা। বিবাহ অনুষ্ঠানে কেউ যদি আত্মীয়-বন্ধুদের নিমন্ত্রণ না করে তাহলে আত্মীয়-বন্ধুরা ক্ষুন্ন হতে পারে, নিন্দাসূচক মন্তব্যও প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু এইমাত্র। তার বেশী আর কিছু হওয়ার সম্ভবনা নেই। অপরপক্ষে, বিবাহ অনুষ্ঠানকে অমান্য করে দুজন নরনারী যদি পরিবারের সূচনা করতে চায়, সহবাস করতে চায়, তাহলে সমাজ তাকে নানাভাবে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করে। বিবাহরূপ অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে পরিবারের সূচনা করা যায় না, কারণ তা সমাজ অনুমোদন করে না। কিন্তু আত্মীস্বজনদের নিমন্ত্রণ না করেও বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবারের সূচনা করা চলে। কাজেই অনুষ্ঠান ব্যক্তির জীবনকে যতটা নিয়ন্ত্রিত করে প্রথা বা আচার ততটা করে না।

আইন (Law)

যদিও মানব সমাজের ইতিহাসে ‘আইন’ শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তাহলেও সাধারণভাবে আইন বলতে রাষ্ট্রীয় আইনকে বোঝায়। বিভিন্ন আইনবিদ্ তথা চিন্তাবিধ্ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর তারফলে আইন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক) বিশ্লেষণমূলক মতবাদ, খ) ঐতিহাসিক মতবাদ ও গ) সমাজত ত্ত্বিমূলক মতবাদ।

হবস্(Hobes), বোঁদা, অস্টিন(Austin) প্রমুখ রাষ্টরবিজ্ঞানীগণ আইনের বিশ্লেষণমূলক মতবাদে বিশ্বাসী। এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে আইন হল সার্বভৌম শক্তির আদেশ। অস্টিনের মতে আইন হল নির্দিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত আদেশ। আইনের এই একই মতবাদে বিশ্বাসী অন্যতম চিন্তবিদ্ হল্যান্ড (Holland) বলেন, 'সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হল আইন।

ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণ কিন্তু আইকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে মনে করেন না। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌দের অভিমত অনুসারে সার্বভৌম শক্তি কখনো সচল আইনের উৎস হতে পারে না। সকল দেশের সমাজব্যবস্থায় বহু সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত থাকে এবং কালক্রমে এগুলি আইনের ন্যায় মর্যাদা লাভ করে ও কার্যকরী হয়। কিন্তু এগুলিকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বা নির্দেশ বলা যায় না। সুতরাং আইনমাত্রেই সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ নয়। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে হেনরী মেইন(Henry Maine), স্যাভিগ্নি (Savigny), মেইটল্যান্ড (Maitland), ক্লার্ক(ClearK) প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবার সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা আইন সম্পর্কে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। সমাজতাত্ত্বিক ধারণায় বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌গণ একথা স্বীকার করেন যে, 'আইন হল সার্বভৌম নির্দেশ যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং এই কারণে তা সর্বক্ষেত্রে মান্য করে চলা বাধ্যতামূলক।' আইনের সমাজতত্ত্বমূলক মতবাদ হল আইনের প্রকৃতিবিষয়ক অন্যতম আধুনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সুন্দর সমাজজীবনের সহায়ক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবের মাধ্যমে আইনের সৃষ্টি। সমাজজীবনের পক্ষে উপকারী বলেই লোক আইন মান্য করে চলে।

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, আইনের সামাজিক উপযোগিতাই আইনের প্রতি মানুষকে অনুগত করে। সমাজতাত্ত্বিক ধারণায় বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌দের অভিমত অনুসারে আইনের উৎপত্তি হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক কারণ ও প্রভাবের ফলে। আইনের মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। এই মতবাদ অনুসারে আইনের সার্থকতা তার বাস্তব উপযোগিতায়। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে অস্ট্রিয়ার গামপ্লোউইক(Gumplowick) ফ্রান্সের দ্যুগুই (Duguit), হল্যান্ডের ক্রাবে(Krabbe) ইংলন্ডের হ্যারল্ড ল্যাস্কির(Harold Laski) এবং মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের রস্‌কো পাউন্ড (Roscoe Pound) ও বিচারপতি হোমস্‌ (Holmes) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

তবে এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উইলসন (Wilson) আইন সম্পর্কিত মতবাদগুলির সমন্বয় সাধন করে আইনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে এই সংজ্ঞাটিকে আইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা বলে মনে করা হয়। উইলসনের মতানুসারে, 'আইন হল স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা সাধারণ নিয়মাবলী হিসাবে সুস্পষ্ট ও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যার পেছনে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বর্তমান' উইলসনের মতকে সমর্থন করে অধ্যাপক গেটেল (Gettell) বলেন, যে সকল নিয়ম রাষ্ট্র সৃষ্টি, স্বীকার ও বলবৎ করে সেগুলিই আইনে পরিণত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীগণ আইনের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। এগুলি হল ঃ ১) আইন হল কতকগুলি বিধিবদ্ধ আচার-ব্যবহার, ২) আইন মানুষের কেবল বহির্জীবনের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, ৩) আইন সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সার্বজনীন, ৪) আইনের পেছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির আনুমোদন থাকে এবং আইন বাধ্যতামূলকভাবে বলবৎ হয়, ৫) সার্বভৌমের সমর্থন হেতু আইনের স্থান সবকিছুর উর্দ্ধে, ৬) আইন বিধিসম্মত ও যুক্তিসম্মত, ৭) আইন গতিশীল ও দেশ-কালভেদে পরিবর্তনশীল এবং সবশেষে ৮) আইন বৃহত্তর সামাজিক জীবনের আপেক্ষিক।

আইন ও প্রথার সম্পর্ক ঃ

প্রকৃত প্রস্তাবে আইন ও প্রথা হল পরস্পরের সহায়ক। যদিও এরা অভিন্ন নয়, উভয়ের মধ্যে বিভিন্নক্ষেত্রে নানা পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু নানারকম পার্থক্য সত্ত্বেও এরা পরস্পর থেকে একেবারে পৃথক সম্পর্কহীন নয়; বরং বলা যায়, উভয়ে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত আইন ও প্রথার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এ প্রসঙ্গে হেনরী মেইন(Henry Maine) তাঁর Ancient Law নামক গ্রন্থে বলেছেন, আইন সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। কারণ আইন যদি সামাজিক নীতি বিজ্ঞান ও প্রচলিত প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তা সহজে এবং কার্যকরভাবে বলবৎ হয়। আর যদি এর ব্যতিক্রম ঘটে, তাহলে আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

প্রচলিত প্রথার পেছনে যে আইন আনুষ্ঠানিক অনুমোদন যোগায় না সে আইন দুর্বল হয়ে থাকে। কারণ প্রথার পেছনে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যে আন্তরিক সমর্থন থাকে, সংশ্লিষ্ট আইন তা লাভ করতে পারে না। অথচ আইনকে যথাযথভাবে বলবৎ বা কার্যকর করার জন্য এই সমর্থন একান্তভাবে অপরিহার্য। এই সমর্থন বাদ দিয়ে আইনের বলবৎ হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সমাজে প্রচলিত প্রথার সাথে সম্পর্কহীন আইন কৃত্রিম বলে প্রতিপন্ন হয়। আর এই কারণে সংশ্লিষ্ট আইন সমাজের অধিবাসীদের কাছ থেকে আনুগত্য অর্জনে অসমর্থ হয়। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা ও প্রথাগত মানসিকতা বিরোধী আইন কখনোই স্থায়ীভাবে কার্যকর হতে পারে না। বস্তুতঃ সমাজে প্রচলিত প্রথার দ্বারা যে আইন সমর্থিত নয়, সেই আইনের সফল সম্ভাবনা খুবই কম। প্রথার ওপর আইনের নির্ভশীলতা প্রসঙ্গে হোরাসের(Horace) অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "What is the use of laws without custom backing them ?'

প্রথা হল আইনের উৎস ঃ প্রথা আইনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন উৎস। কোন প্রথাগত আচরণ যখনই সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়। প্রাচীনকালে আইন ছিল মূলত প্রথামূলক। বর্তমান কালেও প্রত্যেক দেশের আইন ব্যবস্থায় প্রথাগত বিধানের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডের সাধারণ আইন (Common Law) সম্পূর্ণভাবে প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধানের বেশীরভাগ অংশ প্রথাভিত্তিক। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান আইনও হল প্রধানত প্রথাভিত্তিক।

প্রথা আইন ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রথা হল আইনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। আবার অধিকাংশ আইন প্রযুক্ত ও বলবৎ হয় বিভিন্ন প্রথার মাধ্যমে। আর এই কারণে বর্তমানে আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আধিকাংশ আধুনিক আইন বিশেষজ্ঞ পন্ডিত প্রথার ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকার ও সমর্থন করেছেন।

প্রথা আইনের পেছনে সমর্থন যোগায়। তাছাড়া প্রথা আইনের পরিপূরক হিসাবেও কাজ করে। আইন যদি তার সমর্থনে প্রচলিত প্রথাকে পায়, তা হলে সেই আইন সমাজ জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। প্রথা আইনকে সুসংবদ্ধ করে এবং আইন প্রয়োগকে প্রথা সাবলীল করে তোলে।

আইনের পরিপূরক হিসাবে প্রথার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক একইভাবে প্রথার পরিপূরক হিসাবে আইনের ভূমিকার গুরুত্বও অনস্বীকার্য। আধুনিককালের সমাজব্যবস্থায় প্রাচীন, প্রগতিবিরোধী ও অপ্রচলিত বহু ও বিভিন্ন প্রথার পরিবর্তন সম্পাদিত হয় আইনের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি প্রথার কথা বলতে পারি যাদের আইনের মাধ্যমে অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।

তবে আধুনিক নগর ও শিল্পসভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজজীবনে নতুন ধরনের মনোভাব ও আনুগত্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে। তার ফল হিসাবে প্রথার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। অতি সাম্প্রতিককালে পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিততে প্রথা তার অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে সক্ষম রয়েছে আইনের আনুকূল্যে। সামাজিক পরিস্থিতির এই পরিবর্তনের পেছনে কতকগুলি কারণ বর্তমান। যেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১) আধুনিককালে সমাজের গঠন ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। আধুনিক সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন প্রকার জাতি, গোষ্ঠী ও শ্রেণী সমন্বয়ে। সমাজের আর্ন্তভূক্ত সেই সমস্ত অংশের প্রত্যেকের প্রথা পৃথক। স্বভাবতঃই এই রকম অবস্থায় বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সুসংহত ও সমজাতীয় আচার-আচরণ যদি দরকার হয়ে পড়ে, তখন আইনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এই রকম অবস্থায় আইনই পারে প্রথার অপূর্ণতা দূর করতে এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করতে।

২) গোষ্ঠী বা সমষ্টি স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথা তেমন কোন নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না। কারণ প্রথার কোন কর্তৃত্বমূলক এক্তিয়ার নেই। অপরপক্ষে আইনের কিন্তু কর্তৃত্বমূলক এক্তিয়ার আছে। তা ছাড়া আইন বলবৎ করার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। স্বভাবতঃই সমাজবাসীদের স্বার্থ আইনের আওতায় নিশ্চয়তা লাভ করে।

৩) প্রথা অপেক্ষাকৃত নমনীয়। প্রথা বিশেষভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় এ হল প্রথার আর একটি দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতার জন্য প্রথা সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথার পরিবর্তন হয় খুব ধীর লয়ে। অথচ সামাজিক প্রয়োজনের পরিবর্তন ঘটে অতি দ্রুত লয়ে। এই কারণে প্রথা সব সময় সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। স্বভাবতঃই সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজন পূরণের জন্য ও নতুন নতুন অবস্থার মোকাবিলার জন্য আইনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ আইন হল বিশেষভাবে নমনীয়। তাই নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

আইন ও প্রথার মধ্যে পার্থক্য :-

আইন ও প্রথা উভয়ই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া প্রথা ও আইনের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক আছে তা তো আমরা উপরের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্য প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ্ পি. জিসবার্ট (Pascual Gisbert) বলেন, 'The fact that law is the product of design and purpose, is the root of many difference with custom'। এখন আমরা প্রথা ও আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলি যা সমাজবিদ্গণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তা দেখে নিতে পারি।

১) আইন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে, আর প্রথার উদ্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঃ আইন ও প্রথার মধ্যে উদ্ভবগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথা সমাজের সৃষ্টি। সমাজ বা গোষ্ঠী প্রথার উৎস। আপরদিকে আইন হল রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট ক্ষমতাবলে সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিতভাবে আইন প্রণয়ন করে। অপরদিকে প্রথা বলতে আচার-ব্যবহারের সেই সকল রীতিকে বোঝায় যা সামাজিক অনুমোদন লাভ করেছে। বস্তুত প্রথার উদ্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অপরদিকে আইন প্রণয়ন করা হয় এবং তা করা হয় সচেতন ও পরিকল্পিত পথে।

২) আইন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঃ আইনের অস্তিত্ব বিধিবদ্ধভাবে বর্তমান থাকে। স্বভাবতঃই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। আর এই কারণে যে কোন দেশের আইন সম্পর্কে অবহিত হতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রথার বিষয়টি ভিন্ন। বস্তুতঃ কোন দেশে প্রচলিত প্রথাসমূহ কোন বিশেষ গ্রন্থে বিধিবদ্ধভাবে বা লিখিত আকারে থাকে না। সমাজে প্রচলিত প্রথাসমূহ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়।

৩) আইন নমনীয় ও পরিবর্তনশীল ঃ আইন অনেক বেশী নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। আর তাই আইন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজেই সামঞ্জস্য সাধনে সক্ষম। পক্ষান্তরে প্রথা কিন্তু অধিকতর অনমনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়। সহজে প্রথার পরিবর্তন হয় না। আর এই কারণে প্রথার সাহায্যে দ্রুত কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। অথচ জরুরী প্রয়োজনে দ্রুত ও প্রয়োজন মাফিক আইন প্রণয়ন করা যায়। স্বভাবতঃ জরুরী অবস্থার সময় সংকটের মোকাবিলার জন্য আইন দ্রুত রূপায়ন করা হয়।

৪) আইনকে বলবৎ করে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঃ আইনকে বলবৎ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকে। এই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইন প্রযুক্ত ও বলবৎ হয়। তা ছাড়া আইন অমান্য করলে অমান্যকারীকে শাস্তিভোগ করতে হয়। কিন্তু প্রথার ক্ষেত্রে এ সব কথা খাটে না। প্রথাকে প্রয়োগ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকে না। আবার তার কোন দরকারও পড়ে না। সামাজিক কার্যকলাপের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথা কার্যকর হয়। আবার প্রথা লঙ্ঘন করার অপরাধে লঙ্ঘনকারীকে কোন দৈহিক শাস্তিও ভোগ করতে হয় না।

৫) আইন প্রণীত হয় দরকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঃ সাধারণতঃ সমাজজীবনের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে আইনের সম্পৃক্ততা। আইন প্রণীত হয় সুস্থ সমাজজীবনের অস্তিত্বের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ দরকারী বিষয়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, জমিদারী প্রথার বিলোপ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণীত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে প্রথার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় সমাজের প্রাত্যহিক, পরিচিতি ও অতি সাধারণ বিষয়ের ক্ষেত্রেই। সমাজে সাধারণতঃ লোক-লৌকিকতা, খাদ্যাখাদ্য, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রথার প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়।

৬) প্রণীত হওয়ার সাথে সাথে আইন কার্যকর হয় ঃ আইন প্রণীত হওয়ার সাথে সাথে তা বলবৎ হয়। কোন প্রস্তাবিত আইন একইদিনে আইনসভায় প্রণীত হতে পারে এবং তার পর তা বলবৎও হতে পারে। অপরপক্ষে প্রথার অনুমোদন কিন্তু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

৭) প্রথা স্বতঃস্ফূর্ত ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিষয় ঃ আইন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আদর্শমূলক। কারণ মানুষের সুস্থ ও সুচিন্তিত চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবেই আইনের আবির্ভাব ঘটে। অপরপক্ষে প্রথা হল এমন বিষয় যা মূলতঃ সমাজের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের দৈন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে প্রথা হল প্রত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাসম্ভূত বিষয়। অনেক সময় আইনের মাধ্যমে প্রচলিত প্রথার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন প্রথা সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। এই সকল প্রথা আইনের দ্বারা অবলুপ্ত হয়। যেমন হিন্দু কোড বিলের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। এই আইনের দ্বারা হিন্দুদের বিবাহ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বহু প্রথার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৮) অবসানের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ উদ্ভবের ক্ষেত্রে যেমন, অবসানের ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আইনের সৃষ্টি ও প্রয়োগের জন্য আইন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত হওয়া আবশ্যক। অনুরূপভাবে আইনকে কার্যকর করার জন্য আইনের আনুষ্ঠানিক অবলুপ্তি প্রয়োজন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ও স্বীকৃত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবলুপ্ত না হলে আইনের অবলুপ্তি ঘটে না। অপরদিকে প্রথা আপনা-আপনি হারিয়ে যায় বা প্রচলিত হয়ে পড়ে। আর এর জন্য বিশেষ কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা আনুষ্ঠানিক অবলুপ্তির আবশ্যক হয় না।

৯) এক্তিয়ারের ক্ষেত্র ঃ আইনের আঞ্চলিক এক্তিয়ার অনেক বেশী ব্যাপক। প্রথার পরিধি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। প্রথা সাধারণতঃ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আইন বলবৎ হয় অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক মানুষের ওপর।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ